জনসংখ্যা নীতি এবং নারীর প্রজনন অধিকারঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শ্যামলী শীল*

Abstract

Reproductive rights refer to individual's right to decide freely and responsively the number, spacing and timing of having children as well as the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. Women's reproductive rights may also include the right to legal and safe abortion, the right to birth control and freedom from coerced sterilization and contraception. Maintenance of reproductive rights of women is a major concern of the World Health Organization as well as women rights activists. However, it is observed that thoroughout human history women could not practice freedom in reproductive decision making. It was the sates' and societies' demands that determined the couple's choice regarding reproduction. Sometimes women were forced to give more birth as well as to reduce birth. Since the independence, the government of Bangladesh had adopted a population reduction policy. Until 1985 the state espoused a coercive policy for permanent birth control method (mainly female sterilization and use of Depo-Provera, the device which contained the risk of getting cancer) toward a dramatic decline of birth rate. Due to their ignorance, poor women of Bangladesh were in fact forced to do ligation and they had faced severe health hazards. However, such policies had been highly criticized later. At present, the Government of Bangladesh gives emphasis on reproductive rights and safe motherhood toward its population reduction policy.

ভূমিকা

'স্ত্রীলিঙ্গ তার প্রজাতির শিকার।'[১] প্রজননের মাধ্যমে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, হয়ে উঠতে হয় সৃষ্টি ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পুরুষ নিজেকে মুক্ত করে নেয় নিরর্থক জৈবিক পুনরাবৃত্তির কবল থেকে, নিরন্তর চেষ্টা করে নিজের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা সৃষ্টির। কিন্তু নারী? নারীর জন্য শোচনীয় ট্রাজেডি হচ্ছে ইতিহাসব্যাপী তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাসের অধিকার থেকে; নারী আটকা পড়েছে প্রধানত তার প্রজনন ভূমিকায়, তাকে মানুষ হয়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। নিজের প্রজাতির কাছে নারীর দাসত্ব কম-বেশি প্রচন্ড, তবে সেটা ঘটে সমাজ তার কাছে কতগুলো সন্তান প্রসব চায়, সে অনুসারে।[২]

নারীর অতীত, বর্তমান বিশ্লেষণে এবং ভবিষ্যত নির্ধারণে নারীর প্রজনন ভূমিকা এখনও পর্যন্ত প্রধান বিষয় হিসেবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেখানে সস্তা শ্রমিক হিসেবে শ্রম বাজারে নারীর বিপুল অনুপ্রবেশ ঘটছে, অন্যদিকে প্রজনন এবং জন্ম শাসন উভয়ের দায় সমাজ নারীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ এর জ্বলন্ত উদাহরণ, যেখানে নারীর শরীর শিকারে পরিণত হচ্ছে একাধারে বিশ্ব পুঁজির মুনাফার (শ্রমশোষণ ও পণ্যকরণের মাধ্যমে), রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নির্ধারণ (যেমনঃ জন্ম শাসন একটি

*সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন নির্ধারক) এবং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে (যা আবার সামাজিক শ্রম হিসেবে স্বীকৃত নয়) সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ত্রয়ী চাহিদার মূল্য নারীকে দিতে হচ্ছে নির্মম শারীরিক পীড়ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যে নিপীড়নের কথা সমাজে অনুচ্চারিত এবং অনুভূতিহীন এই সমাজে যা নিপীড়ন হিসেবে চিহ্নিতই নয়। 'নারী সর্বংসহা' এই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে এই নিপীড়নমূলক অস্তিত্বই নারীর স্বাভাবিক নিয়তি- পুরুষের কাছে, সমাজের কাছে এবং খোদ নারীর কাছে।

রাষ্ট্র-সরকারের জনসংখ্যা পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকে নারীর প্রজনন ভূমিকা। সুনির্দিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। একটি দেশের সমাজ অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় রাষ্ট্র জন্ম শাসনের পথে হাঁটবে নাকি জন্ম বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করবে। ব্যক্তির প্রজনন অধিকারের বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রায়ই গৌন থাকে। সাধারনত প্রজনন অধিকার বলতে সন্তান ধারণের প্রশ্নে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়। গর্ভধারণ, গর্ভপাত, জন্মনিযন্ত্রণ, এবং প্রজনন সুস্বাস্থ্যের প্রাপ্যতা ইত্যাদি প্রজনন অধিকারের আওতার অন্তর্ভুক্ত। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব এবং প্রসবোত্তর লালন-পালন যেহেতু মুখ্যত নারীরই কাজ, তাই সমসাময়িক ভাবনায় প্রজনন অধিকার বলতে বিশেষত সন্তান জন্মদানের প্রশ্নে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকারকেই নির্দেশ করে। এই লেখার মূল আলোকপাত হবে নারীর প্রজনন ভূমিকা নিয়ে রাষ্ট্র-সমাজের নীতি-দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যা সমাজে নারীর অবস্থান এবং নিয়তি নির্মাণে নির্ধারকের ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের নারীদের প্রজনন জীবনকে আখ্যান হিসেবে তুলে আনা হবে। এ প্রসঙ্গে এখানকার জনসংখ্যা নীতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং এর সাথে নারীর প্রজনন অধিকারের সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা থাকবে।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষত সামাজিক লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন এবং এর রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে মারিয়ারোসা ডল্লা কস্টা, সেলমা জেমস, সিলভিয়া ফেডেরিচি, হাইডি হার্টমেন এবং গেইল রুবিন এঁদের ভাবনা ও তত্ত্বকে আশ্রয় করা হয়েছে।

দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন প্রকট রূপ পেয়েছে, যেখানে নারীর কাজ মূলত প্রজনন, প্রতিপালনএবং গার্হস্থ্যকর্মের মধ্যে সীমিত, আর পুরুষের কাজ উৎপাদন ও উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রসারিত। এই শ্রমবিভাজন নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদা এবং ক্ষমতার ভেদাভেদ করে যেখানে অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত বলে পুরুষের কাজ নারীর কাজের তুলনায় অধিক মর্যাদা পায়। প্রজনন ও গার্হস্থ্যকর্মের সামাজিক ব্যবহারিক মূল্য অনস্বীকার্য, কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সেই কাজই কাজ হিসেবে স্বীকৃত যার বিনিময় মূল্য আছে। এমনতর ভাবনা হেজিমোনিকভাবে হাজির থাকে যার ফলে লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক-পারিবারিক ক্ষমতা সম্পর্কে পুরুষ কর্তা আর নারী অধস্তন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সমাজ বিকাশের সকল স্তরেই লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন ছিল, কিন্তু প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে এধরনের বিভাজন নারী-পুরুষ উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তৈরী করেনি। তখনকার স্বপোষী গৃহভিত্তিক কৃষি উদপাদন ব্যাবস্থায় প্রজনন,

প্রতিপালন এবং উৎপাদনের কাজ একাকার ছিল। মারিয়ারোসা ডল্লা কস্টা এবং সেলমা জেমসং দেখান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বপোষী উদপাদন ভিত্তিক বর্ধিত পরিবারের জায়গায় অনুপরিবারের আবির্ভাব ঘটে, যে পরিবার কাঠামোয় ক্ষমতা সম্পর্কে নারী পুরুষের অধীনস্থ হয়। এই ব্যবস্থায় গৃহভিত্তিক উৎপাদনের স্থলাভিষিক্ত হয় কারখানা এবং বাজার ভিত্তিক উৎপাদন, যেখানে মজুরি ভিত্তিক শ্রমে প্রধানত অন্তর্ভূক্ত হয় পুরুষেরা। ঘর ও বাইরের কাজ আলাদা হয়ে যায় এবং নারী মূলত আটকা পড়ে ঘরের কাজে। এই ব্যবস্থা সামাজিক উৎপাদনের জগতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত করে তাকে অধস্তন সম্পর্কের মধ্যে ফেলে একদিকে নারীর সৃষ্টিশীলতকে বাধাগ্রস্ত করে এবং একইসাথে তার যৌন, মানসিক এবং আবেগীয় স্বাধীনতার ওপর খড়গহস্ত হয়। নারী পরিণত হয় শুধুমাত্র শ্রমশক্তি উৎপাদনের হাতিয়ারে। তাত্ত্বিকগণ একে জরায়ুর পুঁজিবাদী কার্যকরিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪] গেইল রুবিন[৫] পর্যালোচনা করেন ভবিষ্যতের শ্রমশক্তির সরবরাহকারী হিসেবে নারীর প্রজনন ও গার্হস্থ্যকর্মের শ্রমকে আত্মসাৎ করেই পুঁজির অব্যাহত ক্রমবর্ধন নিশ্চিত হচ্ছে।

নারীকে প্রজনন এবং গার্হস্থ্যকর্মের ভূমিকায় আটকে রাখতে এই বিষয়ক সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক আদর্শও জারি থাকে। নারী প্রকৃতিগতভাবেই সন্তান বৎসল এবং প্রজনন, প্রতিপালন ও গার্হস্থ্যকর্মের প্রতি আসক্তি নারীর চিরাচরিত জৈবিক বৈশিষ্ট্য এমনতর ভাবনার পুনরুৎপাদন চলে জীবনে প্রতি পরতে পরতে।[৬]

হাইডি হার্টম্যান[৭] এই পর্যালোচনাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে হাজির করেন। তিনি দেখান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুরিভিত্তিক শ্রমে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটে সস্তা শ্রমিক হিসেবে। কারখানায় পুরুষের চেয়ে নারীর মজুরি কম। এই বাস্তবতায় উপার্জনে অন্তর্ভূক্ত হলেও পরিবার কাঠামোয় নারী কখনই প্রধান উপার্জনকারীর মর্যাদা পায় না, তার ভূমিকা শুধু সহকারি হিসেবে পারিবারিক সচ্ছলতায় বর্ধিত অর্থ সংস্থানের। ফলে এখনও সে মূলত পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং বাইরের কাজের সাথে সাথে প্রজনন ও গার্হস্থ্যকর্মের ঘানিও টানতে হয়। এভাবে শ্রমজগতে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটলেও, তার নিয়তি মূলত আটকা পড়ে প্রজনন এবং প্রথাগত গার্হস্থ্য শ্রমে।

আর এই প্রেক্ষাপটেই প্রজনন ভূমিকা নিয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের চাহিদা, নীতি এবং কর্মসূচি নারীর জীবনে মুখ্য প্রভাবকারী হিসেবে থাকে।

জনসংখ্যা নীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধিপত্যশীল শাসক শ্রেণির চিন্তা-চাহিদা অনুযায়ীই রাষ্ট্রের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। আর জাতীয় পরিকল্পনার চাহিদাই ঠিক করে রাষ্ট্র নারীসমাজের কাছে কম সন্তান চাইবে, না অধিক সন্তান চাইবে অথবা কোনও সুনির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান চাইবে। এ যাবৎকাল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তিন ধরনের জনসংখ্যা নীতির চর্চা দেখা গেছে। এই তিন ধরনের নীতিতে জনসংখ্যা এবং নারীর প্রজনন ভূমিকা নিয়ে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়।

প্রথম নীতিতে 'জনসংখ্যা হচ্ছে শক্তি'। এই ক্ষেত্রে জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর। কখনও কখনও এই চাহিদা পূরণের জন্য অভিবাসীদের অধিগ্রহণও করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর জন্য সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করা হয়

সমাজের নারীদের প্রজনন ক্ষমতার ওপর এবং তাদেরকে অধিক সন্তান গ্রহণ করতে নির্দেশ করা হয়। অধিক সন্তান, বিশেষত পুরুষ সন্তানের প্রয়োজন পড়ে নাগরিক এবং সামরিক উভয় চাহিদার জায়গা থেকেই। জাতীয় উন্নয়নের জন্য অব্যাহত শ্রমিক এবং সৈনিকের প্রয়োজনীয়তা এই চাহিদাকে উস্কে দেয়। এক্ষেত্রে জাপানের উদাহরণ টানা যায়। জাপানের এ যাবৎকালের ইতিহাসে বর্তমান সময়ে জন্মহার সবচাইতে কম। সরকার ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে এর ফলে অদূর ভবিষ্যতেই চাহিদা অনুপাতে শ্রমিকের ঘাটতি হবে। এই পরিস্থিতি জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে হুমকির মুখে ফেলবে। অন্যদিকে বাড়তি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সেবা নিশ্চিত করতে সরকারকে বড় অংকের ভর্তুকির চাপ নিতে হবে। এমন বাস্তবতায় জাপান সরকার নারীদের অধিক সন্তান নেয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করছেন। স্কুল বয়সী এক সন্তানের জন্য ভাল অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তিন সন্তানের অভিভাবকদের জন্য যে পুরস্কার প্রায় দ্বিগুণ। সমালোচকরা একে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানের জনসংখ্যা নীতির প্রতিধ্বনি হিসেবে দেখছেন, যখন জাপানী নারীদের অধিক হারে সন্তান নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। 'ব্রিড এন্ড মাল্টিপ্লাই ফর দি গুড অব দি জাপানিজ এম্পায়ার'[৮]- এটা ছিল তখনকার শাসক শ্রেণির বহুল প্রচারিত স্লোগান। একই পুরুষালী পদক্ষেপ দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানীর ক্ষেত্রেও। যুদ্ধকালীন জার্মানী প্রজনন কাজকেই নারীর প্রধান ভূমিকা হিসেবে নির্ধারিত করেছিল। এই সময়ে চারটি বা তার অধিক সন্তান প্রসবকারী মায়েদের 'ক্রস অব দি অনার অব দি জার্মান মাদার' পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হতো। অন্যদিকে যেসব নারী সন্তান নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন তাদের 'পতিতা', 'শত্রু সহকারী' হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তাদের জন্য শাস্তির বিধানও ছিল।[৯]

দ্বিতীয় নীতিতে সুপ্রজননের ওপর জোর দেওয়া হয়। ইংরেজীতে একে বলে 'ইউজেনিক্স'। জনসংখ্যার আকারের চাইতে গুণসম্পন্ন যোগ্য জাতি গঠন এই নীতির মূল উদ্দেশ্য। বেভিরিজ ১৯৪২ সালে তার বিখ্যাত প্রতিবেদনে যেমন উল্লেখ করেছেন-- কল্যাণমূলক ব্রিটিশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রেষণা ছিল সুযোগ্য 'ব্রিটিশ জাতি' গঠনের সচেতন প্রয়াস।[১০] সুযোগ্য জাতি গঠন নিশ্চিত করতে এই নীতিতে 'সিলেকটিভ ব্রিডিং' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বিশুদ্ধ জার্মান জাতি' গঠনের বিষয়টি এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সিঙ্গাপুরের বর্তমান জনসংখ্যা পরিকল্পনা 'ইউজেনিক্স' নীতিতেই করা হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ দেশের শিক্ষিত নারীদের সন্তান উৎপাদনের কাজকে দেশপ্রেমী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছেন। কেননা, শিক্ষিত নারীদের সন্তান 'উচ্চতর জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে। অন্যদিকে দরিদ্র-অশিক্ষিত নারীদের ঘন ঘন 'নিম্নতর জৈবিক' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তানের জন্ম না দিয়ে তাদেরকে বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করতে এককালীন ১০০০০ ডলার প্রদানের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।[১১]

তৃতীয় জনসংখ্যা নীতির মূল চিন্তা ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রভাবে নির্মিত। ম্যালথাস তত্ত্ব হাজির করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে সমান তালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। তিনি ভবিষ্যত বাণী করেন যে ১৮০০ সালের মধ্যেই বিশ্বের অতি স্ফীত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। যাই হোক, ম্যালথাসের তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত হয়নি। হার্টম্যান[১২] যেমন দেখাচ্ছেন, ম্যালথাস দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিতে

ব্যার্থ হয়েছেন। প্রথমত, ম্যালথাসের মতে বড় কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অধিক হারে মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথচ জনসংখ্যা পরিকল্পিতভাবেই মানুষের সচেতন উদ্যোগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ম্যালথাস মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং এর মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অভূতপূর্ব সক্ষমতার বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হননি।

ম্যালথাসীয় তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত না হলেও, এখনও অনেকের তত্ত্বে ম্যালথাসের সুরের অনুরণন শোনা যায়, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যাবহুল দেশগুলোর দারিদ্র সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৮ সালে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী পল আরলিচ এর বই 'দি পপুলেশন বম্ব' ব্যাপক সাড়া ফেলে। উপনিবেশ উত্তর সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে এশিয়া-আফ্রিকার জনগোষ্ঠী পশ্চিমা জনগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে যাওয়ার বর্ণবাদী ভয়, পশ্চিমা ভোগ বিলাসের বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের অব্যাহত দারিদ্রের চাপ ইত্যাদি বিবিধ প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ফলে ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব শুধু চিন্তার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র বিমোচন নীতি প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে জনসংখ্যা স্থানান্তর ইত্যাদি বিস্তৃত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ না করে জন্মনিয়ন্ত্রণকেই দারিদ্র বিমোচনের প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক এই জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল দায় নিতে হয়েছে নারীদের। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শারীরিক-মানসিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, নতুন-নতুন জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশলের পরীক্ষাজনিত ব্যবহারিক ক্ষেত্র, ছেলে সন্তানের প্রত্যাশায় (রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী জন্মহার কমাতে হবে, অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধ অনুসারে ছেলে সন্তান অধিক কাঙ্ক্ষিত) কন্যা শিশুর গর্ভপাত...সবকিছুর শিকারে পরিণত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের নারীর শরীর।

জনসংখ্যা নীতি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বর্তমানে একজন নারী গড়ে প্রায় দুটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন (টোটাল ফার্টিলিটি রেট ২.৩, প্রতি নারীর)। অতীতের একজন নারীর গড় সন্তান উৎপাদন সংখ্যার সাথে তুলনা করলে চিত্রটি এমন দাঁড়ায়- ১৯৭৫ সালে ৬.৩, ১৯৮৯সালে ৫.১, ১৯৯১ সালে ৪.৩, ১৯৯৩ সালে ৩.৪, ১৯৯৭ সালে ৩.৩, ২০০০ সালে ৩.৩, ২০০৪ সালে ৩, ২০০৭ সালে ২.৭ এবং ২০১১ সালে ২.৩। প্রজননক্ষম দম্পতিদের শতকরা ৬২.৪ ভাগ (পিল ২৭ ভাগ, হরমোন ইঞ্জেকশন ১২.৪ ভাগ, পিরিয়ডিক এবস্টিনেন্স ৬.২ ভাগ, কনডম ৬.৪ ভাগ, নারীদের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ৪.৬ ভাগ, পুরুষের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ১.২ ভাগ এবং অন্যান্য ৪.৬ ভাগ) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছেন , ১৯৭৫ সালে এই হার ছিল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ।[১৩] এই চিত্র একটি বিষয় স্পষ্টতই সামনে আনে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এখনও পর্যন্ত মূল গ্রাহক হচ্ছেন নারী।

১৯৭৫ সালের গড় সন্তান উৎপাদনের হার (৬.৩) এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের হারের (৮ ভাগ) সাথে বর্তমান হারের (গড় সন্তান উৎপাদন ২.৩ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ ৬২ ভাগ) তুলনা করলে বাংলাদেশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রীতিমত সাফল্য অর্জনকারী দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই সাফল্য অর্জন

নিশ্চিত হয়েছে এদেশের দরিদ্র অশিক্ষিত নারীদের অসেচতনতার সুযোগে তাদের শরীরের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ বর্তমানে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে সমাজে আত্মস্থ এবং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এটিকে 'নারীর রিপ্রডাকটিভ রাইটস' হিসেবে প্রতিপাদ্য করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এখানকার দরিদ্র নারীসমাজের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নির্মম ছিল। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ও কর্মসূচির প্রাথমিক ধাপের ওপরই মূলত আলোকপাত করা হবে।

পাকিস্তান আমল থেকেই এ অঞ্চলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু পশ্চিমের মত এই চিন্তার সূত্র নারীবাদী আন্দোলনের 'প্রজনন অধিকার এবং নারীর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ' এমনতর ভাবনার সাথে সম্পর্কিত ছিল না। অর্থাৎ এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ এর বিষয় নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়নি। কিংবা সমাজের ভেতর নারীদের মধ্যে বৃহৎ আকারে এ ধরনের চেতনাও পরিপুষ্ট হয়নি।

আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্যপুষ্ট জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রথম সরকারি পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯৫২ সালে। এই সময় ইস্ট পাকিস্তান ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর লক্ষ্য ছিল জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার ধারণা এবং এর সাথে খাদ্য স্বল্পতা ও উন্নয়ন সম্পর্কের প্রাথমিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই সময়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে পুঁজি করে বেড়ে উঠা উন্নয়ন ও ব্যবসায়ী সংগঠন এবং তাদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। ১৯৪৮ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড পেরেন্টহুড অরগানাইজেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক সময়ে জন ডি রকফেলার ৩ ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স এর অধীনে বিশ্বের ডেমোগ্রাফি এবং জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন। এই কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে বৈজ্ঞানিক বৈধতা দেওয়া যা এসংক্রান্ত ভবিষ্যত ব্যবসার পথকে অগ্রসর করবে। এই সম্মেলনের ফলস্বরুপ পপুলেশন কাউন্সিল গঠিত হয়।[১৪] সমসাময়িক তৎপরতার অংশ হিসেবে ১৯৫৪ সালে রোমে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পৃথিবীর সম্পদের ওপর জনসংখ্যার অব্যাহত চাপের বিষয় তুলে ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে আরেক দফা গুরুত্বের সাথে সামনে আনা হয়। এর পর থেকে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগসমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সরকার সমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন শুরু করে। জনপ্রচারণা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনমত সংগঠনে এই মতাদর্শ সামনে আনা হয় যে, তৃতীয় বিশ্বের অতি জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক এবং দারিদ্রের প্রধান কারণ। এখানে খেয়াল করা প্রয়োজন, তৃতীয় বিশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ভাবনার মূল প্রেষণার জায়গা ছিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এবং ঔষধ বাণিজ্যের বিনিয়োগ ও উপার্জনের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বেছে নেওয়া এবং এই নতুন ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতার জায়গা প্রস্তুত করা।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ এই অঞ্চলে ব্যাপক হারে প্রসারিত হয় ১৯৬৫-৭০ সময়ের মধ্যে। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান সরকার জনসংখ্যাকে ভয়ানক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামে গ্রামে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের উপস্থিতি শুরু হয়, যাদের মূল কাজ ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। এই সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে দুটি গ্রামের প্রায় দুই

হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন ধাত্রী এবং একটি ইউনিয়নের বিশ হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন নারী পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শককে দায়িত্বপ্রাপ্ত করা হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে এই সময়ে মূলত আইইউডি এবং স্থায়ী বন্ধ্যাকরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকে উৎসাহিত করতে পদ্ধতি গ্রাহক, পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী, সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, পেরামেডিক্স সকলের জন্য বিভিন্ন স্কেলে অর্থনৈতিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রণোদনা সত্ত্বেও এই কাজে সাফল্য খুব কমই ছিল। যদিও অর্থ প্রণোদনার যোগান অব্যাহত রাখতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তরফ থেকে আইইউডি এবং স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের ভুলভাল রিপোর্ট প্রদান করে অতি সাফল্য দেখানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা পার হয়ে গেছে এমন বয়স্ক নারী-পুরুষদের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সরকারি পরিকল্পনার এই প্রাথমিক অসাফল্যের প্রধান কারণ এই ছিল যে সাধারণ জনগোষ্ঠী নিজেদের ভেতর থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো তাগিদ বোধ করেনি। এমনকি সন্তান উৎপাদন ' নারীর শরীর ও ব্যক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক' এমনতর পশ্চিমা নারীবাদী চেতনা এখানে নারী আন্দোলনে হেজিমনিক আকারে দেখা দেয়নি। তার চেয়েও বড় কথা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র নারী যারা ছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, তাদের কাছে সন্তান উৎপাদন প্রতিবন্ধক এমনতর চেতনা অজানা ছিল। রাষ্ট্রের নব্য নীতিতে অতি জনসংখ্যা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হলেও অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে অনেক সন্তান মানে ছিল ভবিষ্যতের অনেক শ্রমের হাত অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। স্বামীর পরিবারে নারীর নিরাপদ অস্তিত্বও নির্ভরশীল ছিল তার সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি যাতে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ও বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ব্যাপক হারে যুক্ত হয়েছিল, তা মূলত সম্পর্কিত ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত বিনিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক পুঁজির ক্ষমতার সাথে। যদিও শুরুতে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইস সরকারের পক্ষ থেকে প্রজননক্ষম নারী-পুরুষের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে; কিন্তু যে বিষয়টি প্রচারণার আড়ালে থেকে গেছে তা হল সরকারকে যথাযথ মূল্য দিয়েই এইসব ডিভাইস বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়েছে। আর তার চেয়েও বড় কথা কোনও বাছবিচার ছাড়া এবং শরীরের ওপর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীন উপযোগিতার গবেষণালব্ধ প্রমাণাদির বিষয়ে বিবেচনা না রেখেই এইসব ডিভাইস আমদানি করা হয়েছে। আর এসব ডিভাইস গ্রহণ করতে বছরের পর বছর ধরে প্রধানত এখানকার নারীদের প্ররোচিত করতে একের পর এক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নতুন উদ্ভাবিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইসসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যই বেছে নেয়া হয়েছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র নারীর শরীর। আর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র-সরকারসমূহ তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই উদ্যোগের সহযোগী হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ ও জনসংখ্যা নীতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি নবোদ্যোগে যাত্রা শুরু করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) ঘোষণা করা হয় যে জাতীয় অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিছুতেই ১৫ কোটির বেশি ছাপিয়ে যাওয়া উচিৎ

হবে না।[১৫] এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭৯ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবাকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আইইউডি ও স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণকে সফল করতে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারী মাঠকর্মী, ডাক্তার এবং গ্রাহক সকল পর্যায়ে পূর্বতন প্রবর্তিত অর্থ প্রণোদনা অব্যাহত থাকে।

এই সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের নতুন ডিভাইস ডেপো-প্রভেরা প্রবর্তিত হয়। আইইউডি এর মত এটিও একটি অস্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি। আইইউডি সেবা প্রদানকারী ডাক্তার কর্তৃক নারীর যোনীতে স্থাপন করা হয়। আইইউডি ব্যবহাররত অবস্থায় উক্ত নারী সন্তান ধারনের ঝুঁকিমুক্ত থাকেন। অন্যদিকে ডেপো-প্রভেরা এক ধরনের হরমোন যা নারীর শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রবেশ করানো হয়। এর ফলে শরীরে হরমোনাল পরিবর্তন ঘটে যা সন্তান ধারণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। বেসরকারি সংস্থা গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র এদেশের নারীদের শরীরে ডেপো-প্রভেরার উপযোগিতা পরীক্ষা করার প্রথম উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তারা সাড়ে সাত হাজারের উপরে নারীদের শরীরে ডেপো-প্রভেরার অনুপ্রবেশ ঘটান।[১৬] এই সময়ে ডেপো-প্রভেরার বাণিজ্যিক উৎপাদক উপজন ফেডারেল ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এর সাথে লড়াই করছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে ডেপো-প্রভেরার অনুমোদনের জন্য। কিন্তু কুকুরের উপর পরীক্ষায় ডেপো-প্রভেরার ক্যান্সারজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকায় এফডিএ ডেপো-প্রভেরার নতুন কোনো ধরনের ট্রায়ালের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রও কয়েক বছরের মধ্যেই ডেপো-প্রভেরার গ্রাহকদের মধ্যে এ ধরনের ভয়ঙ্কর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তড়িৎ উদ্যোগ হিসেবে তারা তাদের গবেষণাধীন এলাকায় এর ব্যবহার বন্ধ করে দেন; কিন্তু ততদিনে প্রায় পনের হাজার নারীর শরীরে ডেপো-প্রভেরার অনুপ্রবেশ করানো হয়ে গেছে।[১৭] কিন্তু তার চেয়েও করুণ উপহাস হলো এই সার্বিক পরিস্থিতি জানা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার ব্যাপক পরিসরে ডেপো-প্রভেরার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জনগণের কাছে বিশেষত নারীদের কাছে এর ক্যান্সারজনিত ভয়ানক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি পুরোপুরি চেপে যায়।

এখানে একটি বিষয় আলোচনায় আনা জরুরি। ডেপো-প্রভেরা, আইইউডি, স্থায়ী-বন্ধ্যাকরণ কিংবা পিল যাইহোক না কেন, এইসব জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশলের টার্গেট প্রধানত এদেশের অশিক্ষিত দরিদ্র নারী। ফলে তারা যখন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেন তখন তাদেরকে পদ্ধতিগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথাভাবে অবগত করা হয় না। অন্যদিকে তাদের কাছ থেকেও এই বিষয়ে চাপ প্রয়োগে সচেতন ভূমিকা থাকে না। আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে এইসব ডিভাইসসমূহ আমাদের দেশের নারীদের শরীরের উপযোগিতা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমদানির সময় প্যাকেটের গায়ে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ না থাকলেও কিংবা সামান্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও, আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী যারা অপুষ্টিসহ নানা রোগে ভোগেন, তাদের শরীরে জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইসসমূহের প্রয়োগ মারাত্মক জটিলতা তৈরি করে। পরিবার-সমাজে নারীর স্বাস্থ্যের বিষয় এতটাই গুরুত্বহীন যে নারীরা এইসব জটিলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপোর্টই করেন না বরং চেপে যান। 'নারীমাত্রই নানাবিধ শারীরিক বেদনা সহ্য করতে হবে'- এই পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আবহের কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানকারী মাঠকর্মী এবং

ডাক্তারগণও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজনিত নারীদের রিপোর্টিং এর ততটা গুরুত্ব দেন না। অনেক নারীর সাথে আলাপ করে দেখা গেছে, আইইউডিতে অস্বস্তি বোধ করে খুলে ফেলতে চাইলেও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী ডাক্তার এটি খোলার বিষয়ে সহযোগিতা করেন না বা গররাজি হন; যেখানে গ্রাহকের নিজের একার পক্ষে আইইউডি পরা- খোলা কোনটাই সম্ভব নয়। এভাবে অসচেতন, অশিক্ষিত, দরিদ্র নারীর শরীর শিকারে পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি এবং বহুজাতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ঔষধ বাণিজ্যের। আর একের পর এক পরিবার পরিকল্পনা ও এ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচির বদৌলতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা সামাজিক বৈধতা পায় এবং সমাজের একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। এই কর্মসূচি এতই ব্যাপকতা লাভ করে যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিবিধ বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়ে সত্তরের দশক থেকেই তৎপরতা শুরু করে। ইউএসএইড, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এফপিআইএ, এশিয়া ফাউন্ডেশন, পাথফাইন্ডার ফান্ড, ইউএনএফপিএ, আইপিএভিএস, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি অর্থসাহায্যপুষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ দেশীয় শত শত বেসরকারি সংস্থা পরিবার পরিকল্পনার বহুবিধ কর্মসূচির সাথে জড়িয়ে আছে, দীর্ঘ সময় ধরে যাদের অস্তিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করেছে এদেশের নারীদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদা তৈরির ওপর।

জনসংখ্যা নীতি এবং এর বিশ্লেষণ

এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে প্রকট দৃষ্টান্ত দেখি ১৯৭৮-৮৫ সময়ের মধ্যে, যখন সরকারের পক্ষ থেকে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর জন্য কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কমাতে নারীর গড় সন্তান জন্মদানের সংখ্যা (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) ৫.৮৫ থেকে কমিয়ে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৪.১ এ নামাতে হবে।[১৮] এই লক্ষ্য পূরণে এই সময়ে পিল, আইইউডি, হরমোন ইঞ্জেকশন ইত্যাদি অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তুলনায় স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বভাবতই স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের মূল টার্গেট ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজননক্ষম দরিদ্র দম্পতি বিশেষত নারীরা। এই সময়ে পরিবার পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত কাঠামোগত আয়োজন এবং জনবলের ব্যাপক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের শল্য কার্যক্রমের জন্য এর জরুরত ছিল। পাশাপাশি দরিদ্র দম্পতিদের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের বিষয়ে প্ররোচিত করতে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে ছোট পরিবারের সুবিধা বিষয়ক নানা বিজ্ঞাপন, জনসংখ্যা বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান, নাটিকা ইত্যাদি এ সময়ে গণমাধ্যমের অনুষ্ঠানসূচির একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল। 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার', 'বুদ্ধিমান হোন, ঠিক কাজটি করুন'--- তখন ঘরে ঘরে পরিচিত স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। প্রচার-প্ররোচণার কাজে মসজিদের ঈমামদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ সাধারণ জনগণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বস্তি তৈরি করতো। ফলে মসজিদের ঈমামদের দিয়ে এই বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যা হাজির করা হয়। এই সময়ে লাখ লাখ ঈমামদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে লাইগেশন ও ভেসেকটমির জন্য প্রজননক্ষম নারী-পুরুষদের প্ররোচিত করতে সক্ষম

মাঠকর্মী এবং অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের অর্থ প্রণোদনার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়। একই সাথে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের গ্রাহকদের জন্যও বর্ধিত হারে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় একজন নারী লাইগেশন এর জন্য পেতেন ১০৮ টাকা এবং একটি শাড়ী; আর একজন পুরুষ ভেসেকটমির জন্য পেতেন ১৭৫ টাকা এবং একটি লুঙ্গি। সরকারের তরফ থেকে এসময় বেশি বেশি করে লাইগেশন ও ভেসেকটমির গ্রাহক ধরে আনতে পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীদের ওপর ভীষণ চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ কাজে সফলতার ওপর তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা নির্ভরশীল ছিল। ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অধীনে প্রায় ২৩০,০০০ স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ সম্পন্ন হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয় যে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রজননক্ষম দম্পতিদের শতকরা ৪৩ ভাগেরই (যা রীতিমত বিস্ময়কর) স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ করানো হবে, যার মধ্যে লাইগেশনই হবে প্রধান।[১৯] এই লাইগেশন প্রক্রিয়ার কাহিনীগুলোও ছিল অনেক করুণ। অধিকাংশ দরিদ্র নারীই জানতেন না তাদের সাথে কী করা হতে যাচ্ছে। অপারেশনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের আয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হতো না। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী এবং ডাক্তার লাইগেশন শেষ করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করতেন। অপরেশন উত্তর রোগীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। এভাবে সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চাহিদা পূরণে মাত্র ১০৮ টাকা আর একটি শাড়ীর বিনিময়ে এদেশের হাজার হাজার দরিদ্র নারীদের তাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেটে ফেলে দিতে প্ররোচিত করা হয়েছে; যেটি নিশ্চয়ই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত নারীদের ক্ষেত্রে করা সম্ভব হতো না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী ধাপগুলোতে (১৯৯৬ সালের পর) বাংলাদেশ সরকার অবশ্য এ ধরনের কঠোর দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি থেকে সরে আসে। আন্তর্জাতিকভাবেই নারী অধিকার কর্মী এবং জনসংখ্যা নীতি বিশেষজ্ঞ অনেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ ধরনের কঠোর দমনমূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সমালোচনা করেন। তারা এটাও সামনে নিয়ে আসেন যে এর মাধ্যমে জন্মহার কমানোর বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্যও খুব নগণ্য। দ্রুতই অনুভূত হয় সমাজের সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনুসৃত দমনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়। এই সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ের সাথে মায়ের ও শিশুর সুস্বাস্থ্য, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর প্রজনন অধিকার ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মায়ের সুস্থ স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং সুস্থ শিশুর জন্য ঘন ঘন সন্তান প্রসব পরিহার করা; নারীর নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা কিংবা প্রজননের ওপর নারীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ন্ত্রিত জন্মধারণের গুরুত্ব- ইত্যকার ভাবনা এবং কর্মসূচি প্রধানত গুরুত্ব পায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তকে 'নারীর ক্ষমতায়নের' প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং নারীর বিয়ের নূন্যতম বয়স বাড়ানো, নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিস্তার ইত্যাদি কী কী প্রভাবকের মাধ্যমে নারীর এই 'ক্ষমতায়ন' ও 'প্রজনন অধিকার' নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে সরকার- জনসংখ্যা বিষয়ক দেশি-বিদেশি এনজিওদের গবেষণা তৎপরতা, ইন্টারভেনশন কর্মসূচি এবং এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ সরবরাহের ব্যপক বৃদ্ধি ঘটে যা ক্রমবর্ধমান ধারায় অব্যাহত আছে।

উপসংহার

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমসাময়িক কর্মসূচিগুলোতে 'নারীর প্রজনন অধিকারের' প্রসঙ্গকে সূক্ষ্মভাবে তলিয়ে দেখা জরুরি। সাধারণত প্রজনন অধিকার বলতে ব্যক্তিবিশেষের প্রজনন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়। সন্তান ধারণ কিংবা না ধারণ, গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, যথাযথ যৌন শিক্ষা এবং প্রজনন সুস্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু নারী কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের পরিসংখ্যানগত হার দেখেই নারীর 'প্রজনন অধিকার' নিশ্চিত হচ্ছে এমনতর মূল্যায়ন ঠিক হবে না। কারণ রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারে নারী যে ধরনের অধঃস্তন ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে বাস করে তাতে প্রজনন কিংবা জন্মশাসনের সিদ্ধান্তে নারীর ব্যক্তি ক্ষমতার চর্চার কোনো বাস্তব অবস্থাই নেই। এর চেয়েও বড় কথা 'প্রজনন অধিকারের' নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মূল দায়ভার কিন্তু নারীর ওপরই চাপানো হচ্ছে; যেখানে নারীর জন্মনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ পদ্ধতিরই কোনো না কোনো ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। উপহাসের বিষয় হচ্ছে শুধু ক্যান্সারজনিত ঝুঁকি ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্যসেবায় অন্যান্য ঝুঁকিগুলোকে বিবেচনাতেই নেওয়া হয় না। মাথা ঘুরানো, বিষন্নতা, মুটিয়ে যাওয়া, যৌন অবসাদ প্রতিদিনের এমনতর অস্বস্তি মেনে নিয়ে কোনও পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষকে রাজী করানো যেত না, এটা নিঃসন্দেহ। তার চেয়েও বড় কথা এমনতর ভাবনা আসাটাই দুস্কর। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চেতনা জায়েজ করে যে সন্তান ধারণ যেহেতু নারীর কাজ, জন্মনিরোধের দায়ও তার। এই স্বার্থপর পুরুষতান্ত্রিক চেতনা আবার সন্তান ধারনের কৃতিত্বও নারীকে দিতে চায় না। সন্তান মূলত তার বাবার। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়ের কিন্তু সন্তানের অভিভাবক বাবা। ফলে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবতায় সন্তান যদি হয় ভবিষ্যতের বিনিয়োগ (পরিবারগুলোর সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান ভাবনা) , সেই বিনিয়োগে নারীর কোনও লাভ নেই; সে এক বেগারখাটা শ্রমিক মাত্র।

এমন বাস্তবতায় দেখি, দেশের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির বেশিরভাগ জুড়ে আছে 'নিরাপদ মাতৃত্ব', প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নারীকে জন্মনিরোধে উৎসাহিতকরণের মধ্যে। নারী উন্নয়নের এইসব নীতি এটাই প্রমাণ করে পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমাজ 'প্রজনন অধিকারের' নামে নারীকে মূলত তার প্রজনন ভূমিকার মধ্যেই আটকে রাখতে চায়। এখানে আরেকটি জিজ্ঞাসা অবধারিতভাবেই সামনে আসে-এ যাবৎ সমাজ-রাষ্ট্রের চাহিদাকে ছাপিয়ে প্রজনন অধিকার অর্থাৎ সন্তান নেয়া কিংবা না নেয়ার বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষমতা কতখানি ছিল? মানুষের প্রজনন ভূমিকা কী কেবল ব্যাক্তিগত বিষয়? এই জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানেই সামনে আসে নারীকে প্রজনন ভূমিকায় আটকে রাখা এবং একেই একমাত্র নারীর মহৎ কর্তব্য বলে রূপায়িত করার পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি।

মানুষের প্রজনন ভূমিকা নিছক কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়। শ্রমশক্তি এবং সামরিক শক্তি, সমাজের টিকে থাকার এই দুই ভিত্তির চাহিদা নিশ্চিত করতে চাই অব্যাহত সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা শুরু থেকেই এই চাহিদা নিশ্চিত করেছে নারীর শ্রমজগৎ এবং পুরুষের শ্রমজগতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে। নারীর জগত সীমিত হয়েছে সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন এবং গার্হস্থ্যকর্মে; অন্যদিকে পুরুষের জগত প্রসারিত হয়েছে 'উৎপাদনশীল কাজের জগতে' এবং যুদ্ধক্ষেত্র, রাষ্ট্র-রাজনীতিতে। সমাজ-রাষ্ট্রের এই চাহিদাই নির্ধারণ করেছে বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র নারীর জন্য কী ধরনের প্রজনন

ভূমিকা নির্ধারণ করেছে: কখনো নারীর কাছে অধিক হারে সন্তান প্রসব চাওয়া হয়েছে; কখনও জন্মনিরোধের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; আবার কখনও বিশেষ লিঙ্গের সন্তান প্রসব দাবি করা হয়েছে; সন্তান লালন পালনের জন্য তাকে ঘরের চার দেয়ালে আটকানো হয়েছে, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে জনপরিসর-যুদ্ধক্ষেত্র-রাষ্ট্র-রাজনীতি থেকে; আবার দেখি, বড় বড় যুদ্ধের সময় যখন পুরুষেরা গণহারে যুদ্ধে গেছে, কারখানা শূন্য, এমন অবস্থায় তাকে ঘরের বাইরে এনে কারখানার শ্রমিক করা হয়েছে, এমনকি সৈন্যঘাটতি মেটাতে কখনও কখনো তাকে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়েছে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া, ভিয়েতনাম গেরিলা যুদ্ধে নারীদের অন্তর্ভূক্তি)[২০], আবার যুদ্ধ শেষে তাদের ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

যুগে যুগে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার চাহিদা অনুযায়ীই নারীর নিয়তি নির্ধারিত হয়েছে। এই নিয়তির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে বটে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রজনন ভূমিকাই নারীর প্রধান নিয়তি। নারী পেশাক্ষেত্রে-শ্রমক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে ঠিক, কিন্তু সন্তান উৎপাদন-লালনপালন আর গার্হস্থ্য কর্মের হাল শতভাগ ঠিকঠাক রেখেই ঘরের বাইরে জনপরিসরে তার অনুপ্রবেশকে জায়েজ করতে হচ্ছে।

তবে কি প্রজনন ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করবে নারী ? এটাই কি হবে নারী অধিকারের সমার্থক?

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় পরিবার, সন্তান ধারণ, লালন-পালন এবং নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কিত আলোচনায় আলেকজান্দ্রা কোলন্তাই তরুণ ভাই-ভগিনীগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন পরস্পরকে ভালবেসে জীবন উদযাপন করা তাদের অধিকার। তারা যেন পরিবার ও সন্তানের দায়দায়িত্বের দুশ্চিন্তায় নারী-পুরুষ ভালবাসা সম্পর্কের মতো দারুণ মানবিক বিষয়কে হেলা না করে। কারণ, ভয়ের কিছু নেই। সকল সন্তানদের দায়ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।[২১]

এটাইতো স্বাভাবিক। সকল শিশুর মানবিক বিকাশের দায়-দায়িত্বতো রাষ্ট্রেরই! কারণ, এরাই রাষ্ট্র-সমাজকে টিকিয়ে রাখার ভবিষ্যৎ জনশক্তি। কিন্তু বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তার উল্টোটি ঘটছে। এখানে উৎপাদন হচ্ছে সামাজিকভাবে, দুনিয়াব্যাপী লাখ লাখ শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষের সামষ্টিক শ্রমের ভিত্তিতে; কিন্তু মুনাফা আর ভোগ কুক্ষিগত হচ্ছে গুটিকয়েকের হাতে। পুঁজি-মুনাফা-ভোগ এর উপর্যুপরি উল্লম্ফন এবং কুক্ষিগতকরণ নিশ্চিত হচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যুনতম মানবিক অধিকারকে পায়ে দলে। বিদ্যমান পুঁজি-সম্পদের ক্রমবর্ধমান বিকাশের জন্য অব্যাহত শ্রমিক সরবরাহ অপরিহার্য শর্ত, যার যোগান নিশ্চিত হচ্ছে নারীর সন্তান উৎপাদন ভূমিকার মাধ্যমে। ফলে সন্তান উৎপাদন নিশ্চিতভাবেই সামাজিক কাজ। কিন্তু পুঁজিবাদে মানুষের প্রজনন ভূমিকা এবং সন্তান প্রতিপালনের দায়দায়িত্বকে পরিবারগুলোর ব্যক্তিগত বিষয়ে পর্যবসিত করা হয়-- যেখানে সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন এবং এর সাথে সম্পর্কিত গার্হস্থ্য কর্মের ঘানি মূলত নারীর কাঁধেই চাপে। অন্যদিকে 'সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের' সামাজিক অপরিহার্যিতার বিষয়কে আড়াল করতে নারীর প্রজনন ও গার্হস্থ্যকর্মের ভূমিকাকে 'অকাজ' বলে মূল্যহীন করার মতাদর্শ জারি থাকে সমাজে, পরিবারে, বিজ্ঞাপনে...জীবনের প্রতি পরতে পরতে। এ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কৌশলগত ফাঁকি। যার মাধ্যমে বিদ্যমান রাষ্ট্র-সরকার সকল শিশুর মানবিকভাবে

বেড়ে ওঠার জন্য খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের দায়দায়িত্বকে অস্বীকার করে কিংবা করতে সক্ষম হয়। এমন বাস্তবতায় সন্তানের ন্যূনতম বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে পরিবারগুলো ধুঁকে ধুঁকে মরে, এক্ষেত্রে মা হিসেবে নারীর পরিস্থিতি হয় আরো শোচনীয় এবং নির্মম; ভালবাসা-সৃষ্টি-আনন্দে এখানে জীবন উদযাপনের প্রসঙ্গ অবান্তর। এভাবে অধিকাংশ মানুষের শ্রম, বিশেষত নারীর প্রজনন ও গার্হস্থ্য শ্রমকে আত্মসাৎ করে, একে 'অকাজ' হিসেবে চালিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টিসৌধ পরিপুষ্ট হচ্ছে।

রাষ্ট্র-সমাজ যতদিন পর্যন্ত সমাজের সন্তানদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করছে ততদিন পর্যন্ত প্রজনন ও প্রতিপালনে নারীর একক ভূমিকা নিঃসন্দেহে নারীর মানবিক ব্যক্তি বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। ফলে 'প্রজনন' অধিকারের দাবি শুধু সন্তান নেয়া বা না নেয়া কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গের মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না। এটি প্রসারিত হতে হবে সকল শিশুর মানবিকভাবে বেড়ে ওঠার দাবিতে, নারীর নিজের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের অধিকার, পরিবার-সমাজ-সম্পর্কে সমক্ষমতার চর্চা, জনপরিসর-রাষ্ট্র-রাজনীতি-জননীতিতে অংশীদারিত্ব সর্বোপরি মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে।

তথ্য নির্দেশ

১. সিমোন দ্য বোভোয়ার, *দি সেকেন্ড সেক্স*, হুমায়ুন আজাদ (অনূদিত), আগামী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৪৩

২. সিমোন দ্য বোভোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৩. Mariarosa Dalla Costa and Selma James, *The Power of Women and the Subversion of the Community,* Falling Wall Press Ltd, England, 1975, p. 30

৪. Mariarosa Dalla Costa and Selma James, ibid, p. 31

৫. Gayle Rubin, "The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex" in Ranya R. Reiter (ed.) *Toward an Anthropology of Women,* New York: Monthly Review Press, 1975, p. 170

৬. Silvia Federici, *Wages Against Housework,* Power of Women Collective and the Falling Wall Press, Bristol, 1975, pp. 2-3

৭. Heidi Hartmann, The Historical Roots of Occupational Segregation- Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex, *Signs: Journal of Women in Culture and Society,* Vol. 1, Number 3, Part 2, 1976, p. 139

৮. Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR), 1991 কর্তৃক উল্লেখিত পর্যালোচনা, file:///C:/Users/sociologylab/Downloads/Yuval_Davis% 20(1).pdf, Access-13.03.2017

৯. Sinisa Malesevic, "Gendering of War" in *The Sociology of War and Genocide,* Cambridge University Press, UK 2010, p. 298

১০. William Beveridge, Report on Social Insurance and Allied Services, London: HMSO, 1942, p. 103

১১. Nira Yuval Davis, Nationalist Projects and Gender Relations, *Nar. Umjet,* 40/1, 2003, p. 13

১২. Betsy Hartmann, *Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control and Contraceptive Choice,* New York: Harper and Row, 1987, p. 35

১৩. Bangladesh Demographic and Health Survey, 2014, pp. 53 & 74

১৪. Farida Akhter, *Depopulating Bangladesh- Essays on the Politics of Fertility*, Narigrantha Probartana, 2005, p. 15

১৫. Government of People's Republic of Bangladesh, First Five Year Plan, (1973-78): Planning Commission, Bangladesh, p. 538

১৬. Mellisa Tennyson, Women, (Under)Development, Empire: The Other(ed) Margins in American Studies, PhD thesis, Programme in American Studies, Washington State Universirty, 2010, p. 207

১৭. Farida Akhter, op cit, p. 20

১৮. Government of People's Republic of Bangladesh, Second Five Year Plan, (1980-85): Planning Commission, Bangladesh, http://www.popline.org /node/501042, Acess-16.03.2017

১৯. Farida Akhter, op cit, p. 26

২০. Sinisa Malesevic, op cit, p. 301

২১. Alexandra Kollontai. "Communism and the Family" in *The Worker*, 1920. https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm, Access-15.03.2017